উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোমবার ২ বৈশাখ ১৪২৫ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ৩২৬ সংখ্যা

ব্যক্তিতে নজরদারি

একটি সোশ্যাল মিডিয়ার সাধারণ মানুষের তথ্য চুরি এবং তাকে ভোটের কাজে লাগানো হয়েছে বলে বিশ্বজোড়া অভিযোগ, হইচইয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে ভারতও। এদেশের শাসকগোষ্ঠী এবং প্রধান বিরোধী দল সহ একাধিক রাজনৈতিক দল এ নিয়ে প্রতিবাদ জানালেও মূল গলাটা শোনা গিয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের। বড়ো ট্র্যাজেডি হল– যে বিজেপি সুর চড়িয়ে এমন ঘটনার নিন্দা করছে, কংগ্রেসের তুমুল সমালোচনায় মুখর হয়েছে, সেই বিজেপি–ই দেশের মানুষের অধিকার খর্ব করতে একাধিক অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ করেছে। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চেয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর জারি করা বিজ্ঞপ্তি বাতিল করেন প্রধানমন্ত্রী তথা শাসকদল বিজেপির শীর্ষ নেতা। কিন্তু বিষয়টা অত সহজে মিটে যায়নি। সংবাদমাধ্যমের উপর অলিখিতভাবে নজরদারি চলছেই। ইতিমধ্যেই, নরেন্দ্র মোদির সরকার আরও একটি পদক্ষেপ করতে চলেছে। এবার সংবাদমাধ্যমের উপর নয়, আমজনতার উপর নজরদারি। সাধারণ মানুষের ঘরে এবার উঁকি দিতে চলেছে কেন্দ্রের সরকার। শুধু উঁকি নয়, রীতিমতো সর্বক্ষণের নজরদারি চলবে। দেশের মানুষ টেলিভিশনে সারাদিন কী দেখেন, কোন কোন চ্যানেল দেখেন, বিনোদন সংক্রান্ত নাকি খবরের চ্যানেল তার হিসাব নিতে চাইছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী। যদিও তারা বিষয়টিকে হিসাব নয়, একটা প্রাথমিক ধারণা হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে চাইছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। কেন্দ্র প্রত্যেকটি মানুষের সম্পর্কে এমন তথ্য সংগ্রহ করতে চায়, যে তথ্যকে সামনে রেখে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়তে চায়। কেউ যদি বেশির ভাগ সময় খেলা, বিনোদন, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি চ্যানেল দেখেন তাহলে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা তৈরি হবে। আর যিনি বেশির ভাগ সময় খবর বা রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ দেখান তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বা তাঁদের সম্পর্কে 'অন্য' ধারণা তৈরি হবে কেন্দ্রের। আপাতত যতটুকু জানা এবং বোঝা যাচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষের কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ সংক্রান্ত কেন্দ্রের কাছে গোপন থাকবে না। এই নজরদারি চালানোর জন্য প্রতিটি সেটটপ বক্সের মধ্যে একটি মাইক্রোচিপ রাখা হবে, যার মাধ্যমে সব তথ্য চলে যাবে কেন্দ্রের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মোটামুটিভাবে মানুষকে দুটো শ্রেণিতে ভাগ করার তোড়জোড় চলছে। খবর বা রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহীদের অন্যদের বিভাগ থেকে আলাদা রাখা হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেখানে নজরদারির পরিমাণও অনেকটাই বেশি হবে। বিষয়টিতে খানিক নতুনত্ব থাকলেও সামগ্রিকভাবে নজরদারিতে কোনো নতুনত্ব নেই। সব রাজা, তা সে ছোটো হোক বা বড়ো, চান প্রজারা তাঁর বশংবদ হয়ে থাকবেন। আর তার জন্য যে কোনো পদ্ধতিই তাঁরা কাজে লাগাতে চান। কোনো সরকার, তার মন্ত্রীসভার সদস্যরা সংবিধানে যথাযথভাবে রাখার অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় আসীন হন। অথচ তার পরেও সেই সংবিধানে উল্লেখিত সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নানাভাবে লঙ্ঘন, হরণ, খর্ব করার ষড়যন্ত্র কীভাবে করা হয় তা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এদিক থেকে কেন্দ্র বা রাজ্য, কেউই কারও চেয়ে খুব পিছিয়ে নেই। অথচ এক তরফের কাজের প্রতিবাদ অন্য তরফ থেকে খুব বেশি শোনা যায়। বাস্তবে কোনো রাজা বা সরকারই চায় না তাদের সমালোচক গোষ্ঠী তৈরি হোক, পথেঘাটে তাদের নেতিবাচক বা ভুল কাজের সমালোচনা হোক। এদেশের সরকার পক্ষ, ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধিরা শুধু নিজেদের স্তুতি শুনতেই পছন্দ করেন। তার অন্যথা হলেই দাঁত, নখ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বরূপ প্রকাশে খুব বেশি সময় লাগে না। এমন ঘটনার উদারহণ কিন্তু এদেশে ভূরিভূরি রয়েছে।

অমৃতধারা

সমাজের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহার বিকাশের ফলেই সামাজিক শুভ পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হইতেছে। এই শক্তিগুলি সুদৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ হইলে সমাজও নিজেকে তদনুরূপ গড়িয়া তুলিবে। প্রত্যেককেই যেমন নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং তাছাড়া উপায় নাই, প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধেও একই কথা। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার যেসব নিজস্ব ভালো বিধিব্যবস্থাদি আছে, ওইগুলির উপর ওইসব জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং ওইগুলিকে অন্য জাতির ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়া চলে না। যতদিন না কোনো উন্নততর বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়, ততদিন পুরাতনগুলিকে ভাঙিয়া ফেলার চেষ্টা করা মারাত্মক। উন্নতি সবসময় ক্রমশ ধীরগতিতে হইয়া থাকে। সব সামাজিক রীতিনীতি অল্পবিস্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া ওইগুলির ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়া খুবই সোজা। কিন্তু তিনিই মনুষ্য জাতির যথার্থ কল্যাণকামী যিনি মানুষ যেকোনো সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জীবনযাপন করুক না কেন, তাহার অপূর্ণতা দূর করিয়া দিয়া তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দেন, ব্যক্তির উন্নতি হইলেই সমাজ ও জাতির উন্নতি হইবে।

ধার্মিক ব্যক্তিগণ সমাজের দোষত্রুটি ধরিতে যান না, কিন্তু তাঁহাদের প্রেম, সহানুভূতি ও সততা তাঁহাদিগকে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করে। উহাই তাঁহাদের নিকট অলিখিত শাস্ত্র। যে সকল জাতি বা সমাজ ক্ষুদ্র লিখিত শাস্ত্রীয় গণ্ডির উপরে উঠিতে পারে, তাহারাই যথার্থ সুখী। সৎ লোকেরা এই শাস্ত্রীয় গণ্ডির উপরে ওঠেন ও তাঁহাদের প্রতিবেশীগণ যেকোনো অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাহাদিগকে এইরূপ উঠিতে সাহায্য করেন। ভারতের মুক্তিও সেইজন্য ব্যক্তির শক্তিবিকাশ ও তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম–উপলব্ধির উপরই নির্ভর করে।

–স্বামী বিবেকানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ১৯৭৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি ঃ ১। বাসা বানাতে ওস্তাদ পাখি ৪। তরল পদার্থ মাপার একক ৫। চোখের জল ৭। অভিযোগ জানানো ৮। যে মহিলার চোখ খুব সুন্দর ৯। যা দিয়ে বাক্স ও তালা খোলা যায় ১১। একদম আগ্রহী নয় ১৩। এর পুতুল মানে আদরের দুলাল ১৪। থানার বড়বাবু ১৫। কাজের চাপ বা খাটুনি।

উপর–নীচ ঃ ১। কিছু পাওয়ার জন্য বার বার চাওয়া ২। পদ্মা নদীর বিখ্যাত মাছ ৩। যে আম এখন পুরো পাকেনি ৬। দশরথের ছোটোরানি, লক্ষ্মণের মা ৯। অপরাধীকে বিচারের জন্য আদালতে পাঠানো ১০। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট খরচে যিনি কাজের চুক্তি নিয়ে থাকেন ১১। খুব গভীর ও বিশাল যার তল পাওয়া যায় না ১২। হাত দিয়ে ধরার উপযোগী।

সমাধান ■ ১৯৭২

পাশাপাশি ঃ ১। অঙ্গরাগ ৩। গলুই ৫। বিবদমান ৭। সজাতি ৯। সতীন ১১। মামদোবাজি ১৪। চর্পটি ১৫। সুলতানা।

উপর–নীচ ঃ ১। অধিবাস ২। গরিবি ৩। গলদ ৪। ইমান ৬। মালতী ৮। জালিম ১০। নজরানা ১১। মারীচ ১২। দোপাটি ১৩। জিজ্ঞাসু।

ইঞ্জিনিয়ারিং আজ আর সবাইকে চাকরি দেয় না, সতর্কতা চাই

ইঞ্জিনিয়ারিং আজ আর কাজ জোটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। যা আসন সংখ্যা তার অর্ধেক আসনে ছাত্রছাত্রীরা ভরতিই হচ্ছে না। যারা ভরতি হচ্ছে তারা নানা অব্যবস্থার শিকার হচ্ছে। এরপর পাস করাদের অর্ধেকের কম ক্যাম্পাসিং-এর মাধ্যমে কাজ পাচ্ছে। যাদবপুরে পিয়োন পদে ইঞ্জিনিয়ারদের আবেদন ভাবী অভিভাবকদের সতর্ক হতে বলছে। লিখেছেন মৈনাক কুণ্ডা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিয়োন পদের জন্য সম্প্রতি আবেদন করেছিলেন পিএইচডি থেকে শুরু করে বি টেক, এম টেক ডিগ্রিধারীরা। পশ্চিমবঙ্গের ব্লকে ব্লকে এখন উন্নয়নের ঢাক বাজছে চড়াম চড়াম করে। ঠিক এই সময়ে কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তির মতো ইঞ্জিনিয়ারিং উত্তীর্ণদের ভিড় বিশ্ব বাংলার বড়ো একটা সুখকর বিজ্ঞাপন নয়। পনেরো হাজার টাকার চাকরির জন্য কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের এই ভিড়, বেকারত্বের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। এটা ঘটনা যে, এই নিদর্শন শুধু বাংলার ক্ষেত্রে নয়, গোটা ভারতবর্ষেই আজ এটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর বাস্তবতা। যাদবপুরে ৭০টি পিয়োন পদে আবেদন করেছিলেন ১১ হাজার জন। উত্তরপ্রদেশে ৩৬৮টি পিয়োন পদে আবেদন করেছিলেন ২৩ লক্ষ। ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস হলেও আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল ২ লক্ষের বেশি ইঞ্জিনিয়ার। পাশাপাশি এটাও ঘটনা, পিয়োন পদে এত এত ইঞ্জিনিয়ার–এর আবেদন দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাকে বড়ো এক প্রশ্নের সামনে এনে ফেলেছে।

ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার শুরু সেই ইংরেজ আমলে। মূলত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল তখন শিক্ষার বিষয়বস্তু। রাও কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৪৭ সালে রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১৮৫৬ সালে শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হল প্রথমদিকের কলেজ। এরপর শিল্পে অগ্রগতির প্রয়োজনে উচ্চমানের কারিগরি প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলে সরকার কমিশন। গড়ে ওঠে আইআইটিগুলো কালক্রমে। সেই বছরই দেশের সমস্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন, এআইসিটিই। এই সংস্থাই নির্ধারণ করে কোন কোন শর্তাবলি পূরণ করার ভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে অনুমোদন দেওয়া হবে। এই সংস্থাই নির্ধারণ করে দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর অনুমোদন কতদিন চালু থাকবে। কত ছাত্র–ছাত্রী ভরতি হবে, কতজন অধ্যাপক পড়াবেন ইত্যাদি সমস্ত কিছু। একটা সময়ে এই সংস্থা যথেচ্ছ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে তোলার অনুমোদন দিয়েছে। উদারনীতির আবহে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আজ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, আগামী ২০১৮–১৯ শিক্ষাবর্ষে দেশের ২০০টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে। দেশজুড়ে এক বছরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৮০ হাজার আসন কমিয়ে আনা হবে। কলেজগুলোকে 'সাব স্ট্যান্ডার্ড' বলা হয়েছে এই নিয়ন্ত্রক সংস্থার তরফে। শুধু তাই নয়, এই সংস্থা আরও যা জানাচ্ছে তা অভিভাবকদের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। গত চার বছরে দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা কমেছে ৩ লক্ষের উপর। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতির সংখ্যাও ভীষণভাবে কমে এসেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা নিয়ে যে একটা মিথ ছিল সেটা আজ ভেঙে চৌচির। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার অর্থই ছিল সোনালি একটা স্বপ্ন সাকার করার চাবিকাঠি হাতে পেয়ে যাওয়া। তেমনটা আজ আর হচ্ছে না। বিশ্বায়নের বিশ্বাস হাতে নিয়ে দেশের সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই করেছে লাগামছাড়া ভাবে। বেসরকারি বিনিয়োগে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কার্যক্রম রূপায়ণ করা হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। দেশের উন্নতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে দেওয়া হয়েছে ছাড়। সংখ্যার ক্ষেত্রে, গুণমানের ক্ষেত্রে ছাড়। কয়েকবছর আগে ম্যাকিনসে রিপোর্ট বলছিল ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটদের চার ভাগের একভাগ মাত্র কাজ করার মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারে। আজ সেটা আরও কম। যুগের সঙ্গে অনুপযোগী পাঠ্যক্রম, পরিকাঠামোর অভাব, শিল্পের সঙ্গে সংযোগহীনতা এবং মারাত্মক রকম শিক্ষক স্বল্পতা ডেকে এনেছে বিপদ। দেখা যাচ্ছে, বিগত দুটো বছরে কলেজগুলোর আসন সংখ্যার প্রায় অর্ধেক খালি পড়ে থাকছে। দেশের প্রিমিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বাড়ছে। তাল মিলিয়ে বাড়ছে ছাত্র ভরতি। কিন্তু সরকার বাকি ফেলে রেখেছে শিক্ষক পদে নিয়োগ। বেসরকারি কলেজে বিনিয়োগ করাই হয়েছে মুনাফার উদ্দেশ্যে। ছাত্র কম ভরতির অর্থ হল কলেজের আজ কমা। মুনাফা ঘরে তোলার তাগিদে খরচ ছাঁটাই করা হবে। বেতন বাবদ যে খরচ তা নিয়মিত প্রতি মাসে করে যেতে হয়, অর্থাৎ রেকারিং এক্সপেনডিচার। অতএব খরচ ছাঁটাই–এর মাধ্যমে, মুনাফা তোলার তাগিদে শিক্ষক পদ ফাঁকা থাকবে, যারা কাজ করছেন তাঁরা মাঝপথে বেকার হতে পারেন। ছাত্রদের এই শিক্ষকহীনতার সঙ্গে তাল মিলিয়েই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভরতির সময় আইন ভেঙে ছাত্রের মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিক মার্কশিট, সার্টিফিকেট কলেজ রেখে দেয়। যাতে পড়ুয়ারা অন্যত্র চলে যেতে না পারে। এরপর চলে এক সেমেস্টার থেকে অন্য সেমেস্টারে ভরতির পালা। অবশ্যই তখন টাকা দিতে হয়। তারপরেও পাস করে চাকরি অনিশ্চিতই থেকে যায়। সন্তান কাজ না পেয়ে পিয়োনের লাইনে দাঁড়ায়। সন্তানের দুধে–ভাতে থাকার স্বপ্ন চোখের সামনে ভেঙে যেতে দেখেন অভিভাবক।

আজও সরকারি ক্ষেত্রই দেশের চালিকাশক্তি। সরকারি কলেজে অব্যবস্থা বেসরকারি ক্ষেত্রজুড়ে বিশৃঙ্খলা চলার সবুজ সংকেত জারি করে। দেশে আইআইটির সংখ্যা বাড়ছে। এই মুহূর্তে দেশে ২৩টি আইআইটি। ভুগছে সম্মিলিতভাবে ৩৪ শতাংশ অধ্যাপক স্বল্পতার সমস্যায়। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের থেকে তথ্য নিয়ে খবরের কাগজ খবর করেছে। দেখা যাচ্ছে, গোয়ার আইআইটিতে ৬২ শতাংশ শিক্ষক পদ ফাঁকা। ভিলাইয়ে ৫৮ শতাংশ, খড়গপুরে ৪৬ শতাংশ শিক্ষক পদ ফাঁকা। এটা এই অর্থবর্ষ শুরুর দিনের চিত্র। আইআইটি যদি এত ফাঁকা শিক্ষক পদ নিয়ে ডিগ্রি দিতে পারে, অন্য কলেজগুলো কী দোষ করল? সুতরাং শিক্ষার নামে ব্যবসা করার ঢালাও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসার স্বার্থে চার বছর শেষে ডিগ্রি দিলেও দক্ষতা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। শিক্ষার বাজারে এক ব্যবসায়ী অর্ধ দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছে। কারা সেই ইঞ্জিনিয়ার? যারা মাধ্যমিক স্তরে তুলনামূলক ভালো ফল করে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছে এবং পাস করেছে। কোনো না কোনো এন্ট্রান্স পাস করেছে। চার চারটে বছর একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পড়াশোনা শেষ করেছে। কাজের বাজারে অন্য ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার–এর খোঁজ করছে এবং এই অদক্ষদের বাতিল করছে। শুধু বেসরকারি ক্ষেত্রেই বা কেন? মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর সত্যপাল সিং এই মাসের শুরুতেই রাজ্যসভাকে জানিয়েছেন মন খারাপ করা খবর। দেশের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য চলছে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সাহায্যে 'দ্য টেকনিকাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম।' ২৬৬০ কোটি টাকার প্রকল্প এটি। মন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী দেশের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলোর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুমোদিত পদের প্রায় ৫৫ শতাংশ এখন ফাঁকা। কিছু চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক দিয়ে ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। গতবছর এই একই মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ারদের ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে চাকরির তথ্য প্রদান করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ অম্বিকা সোনির প্রশ্নের উত্তরে।

দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র–ছাত্রীর ক্যাম্পাসিং-এর মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার হার

বছর	চাকরি পাওয়ার শতকরা হার
২০১৩–১৪	৩৮.১৮
২০১৪–১৫	৪২.৪৮
২০১৫–১৬	৪২.৯৭

সূত্র ঃ রাজ্যসভায় অ–তারকাখচিত ১২২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর। তারিখ ২৮/১২/২০১৭

ইতিমধ্যেই দেশের সর্ববৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট এন্ট্রান্স, এআই ট্রিপল এবছরই হয়ে গিয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ট্রান্স–এরও অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া চলছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে অভিভাবকরা যদি এটা মেনে নেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং আজ আর কাজ জোটানোর ক্ষেত্রে সর্বরোগহর বটিকা নয়, তবে মঙ্গল। যা আসন সংখ্যা তার অর্ধেক আসনে ছাত্র–ছাত্রীরা ভরতিই হচ্ছে না। যারা ভরতি হচ্ছে তারা নানা অব্যবস্থার শিকার হচ্ছে। এর পর পাস করাদের অর্ধেকের কম ক্যাম্পাসিং–এর মাধ্যমে কাজ পাচ্ছে। এই অব্যবস্থার ব্যবস্থাতে ভেবেচিন্তে পা না ফেললে হতাশায় ডুবে যেতে হবে। কলেজে বিগত দিনে ক্যাম্পাসিং হার, শিক্ষক আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জেনে নিতে অল্প ফেলুদা হতে হবে। যাদবপুরে পিয়োন পদে ইঞ্জিনিয়ারদের আবেদন ভাবী অভিভাবকদের সতর্ক হতে বলছে। সময়ের ডাক অভিভাবকরা শুনলে মঙ্গল।

> আগামী ২০১৮–১৯ শিক্ষাবর্ষে দেশের ২০০টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে। দেশজুড়ে এক বছরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৮০ হাজার আসন কমিয়ে আনা হবে। গত চার বছরে দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা কমেছে ৩ লক্ষের উপর। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতির সংখ্যাও ভীষণভাবে কমে এসেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা নিয়ে যে একটা মিথ ছিল সেটা আজ ভেঙে চৌচির। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার অর্থই ছিল সোনালি একটা স্বপ্ন সাকার করার চাবিকাঠি হাতে পেয়ে যাওয়া। তেমনটা আজ আর হচ্ছে না।

জনমত

সরকারি বাসে আসন সংরক্ষিত হোক

সঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে সরকারি বাসের কোনো বিকল্প নেই। এই কারণে সরকারি বাসের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবহণ দপ্তর লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা সারা উত্তরবঙ্গজুড়ে যেসব রুটে বাস চালায় তার প্রত্যেকটিতে উপচে পড়া ভিড় থাকে। আর এই ভিড়ে সবচেয়ে অসহায় মহিলা ও বৃদ্ধরা। প্রচণ্ড ভিড়ে জায়গা দখলের লড়াইয়ে তাঁরা কখনও আসন পেতে সমর্থ হন না। কোনোমতে বাসে উঠতে পারলেও বাসের ভেতরের প্রচণ্ড ভিড়ে আবার অসহায় বোধ করতে থাকেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু বাসের সিটে বসে থাকা পুরুষ যাত্রীরা মানবিকতার খাতিরে মহিলা ও বৃদ্ধদের জন্য সিট ছেড়ে দেন না, যেহেতু তাঁরা হয়তো প্রচণ্ড লড়াই করে সিটে বসবার সুযোগ পেয়েছেন। এরকম অবস্থায় সবচেয়ে করুণ দশা হয় যদি কোনো মহিলা বাচ্চা কোলে নিয়ে ভিড় এবং চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এসব বিবেচনা করেই কলকাতার বাসগুলোতে মহিলা ও বরিষ্ঠ নাগরিক সহ প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে এবং তা খুব ভালোভাবে অনুসরণ করেন বাসযাত্রী ও বাসকর্মীরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস এবং উত্তরবঙ্গের বেসরকারি বাসগুলোতে এখনও এই নিয়ম চালু হয়নি। কয়েক মাস আগে বাসের ভেতরে সিটের গায়ে অথবা পাশে স্টিকার লাগিয়ে সেই নিয়ম চালু করার চেষ্টা করা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। বেশিরভাগ স্টিকার এখন প্রায় তুলে ফেলা হয়েছে। স্টিকার থাকলেও সংরক্ষিত আসন দখল করে বসে থাকতে দেখা যায় পুরুষ যাত্রীদের এবং তার পাশে মহিলা, প্রতিবন্ধী অথবা বৃদ্ধদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও আসন ছেড়ে দেন না তাঁরা। এর কারণ একটাই, এখনও মানুষ সচেতন নয়।

মহিলা, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ যাত্রীরা কখনোই তাঁদের আসন ছেড়ে দিতে বলেন না, কেননা তাঁরাও এ ব্যাপারে তেমনভাবে সচেতন নন। আবার সাধারণ যাত্রীরাও সচেতন নন। তাই আসন ছেড়ে দেবার বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলে মনে করেন না। বাসকর্মীরাও ডিপো থেকে বাস ছাড়ার পূর্বেই বাসের সমস্ত আসনে টিকিট ইশ্যু করে দেন। এতে আগে থেকে সব সংরক্ষিত আসন দখল হয়ে যায়। মূলত সচেতনতার অভাবেই এটি চালু করা হয়ে উঠছে না। আসন সংরক্ষণের নিয়ম চালু করে দীর্ঘদিন ধরে সচেতনতামূলক প্রচার চালালেই এর সফলতা আসবে।

অভিজিৎ সরকার, সহকারী অধ্যাপক
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ, হিলি।

বিনামূল্যে বই কেন ?

গত ১৪ এপ্রিল প্রকাশিত মোঃ হকের পত্র প্রসঙ্গে দু–এককথা না বলে পারছি না। বিগত বাম সরকার প্রাথমিকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া আরম্ভ করে। তখনও সময়মতো পড়ুয়ারা বই পেত না, এখনও সেই সমস্যা রয়েই গিয়েছে। আমার প্রশ্ন হল, বিনামূল্যে বই দেওয়া কি আবশ্যিক ? সবার জন্য বিনামূল্যে বই কেন দেওয়া হবে ? সরকার যদি এই বই স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করে তবে যেমন সরকারি কোশাগারে অর্থ সংগৃহীত হবে, ঠিক তেমনি পড়ুয়ারা দোকান থেকে বই কিনতে পারবে। যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই তাদের জন্য বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হোক বা তাদের পরিস্থিতির উপর নজর রেখে অর্থসাহায্য করা হোক। সবার জন্য বিনামূল্যে বই দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

তপেশ ভৌমিক, প্রাক্তন শিক্ষক
গুড়িয়াহাটি, কোচবিহার।

অনুরোধ

জনসাধারণের সুবিধার্থে রেল দপ্তরের কাছে অনুরোধ, পদাতিক এক্সপ্রেসকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হোক। এতে জলপাইগুড়ি–হলদিবাড়ি বা পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের খুবই উপকার হয়। রেল দপ্তর যেন একটু বিবেচনা করে বিষয়টি। এর সঙ্গে আর একটা অনুরোধ, দার্জিলিং মেল লিংকে আর দুটি স্লিপার কামরা যুক্ত করা হোক, তাহলে আমরা সকলে খুবই উপকৃত হব।

রানু রায় (ভট্টাচার্য)
ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি।

যানজট ও সচেতনতা

সর্বদা দেখা যায় যখন কোনো রেলগেট অথবা একমুখী রাস্তা বন্ধ থাকে, তখন সমস্ত বাইক, অন্য যানবাহন বন্ধ গেটের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং গেট খোলার অপেক্ষায় থাকে। সেই সময় দেখা যায়, কিছু গাড়ি বা বাইক দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনকে অতিক্রম করে ডানদিক দিয়ে সামনে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ায়। ফলে পুরো রাস্তাটি যানবাহনে পূর্ণ হয়ে যায়। গেটের অপর পার্শ্বেও একই অবস্থা সৃষ্টি হয়। যখন গেট বা রাস্তা খোলে তখন উভয়–উভয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, রাস্তায় এমন পরিসর থাকে না যাতে যান যেতে পারে। এতে দীর্ঘক্ষণ সেই এলাকায় যানজটে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে আমি প্রতিটি নাগরিকের কাছে আবেদন রাখছি, দয়া করে সবসময় ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন। পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, দয়া করে এই বিষয়ে সচেতন হতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করুন, বাধ্য করুন।

দেবদাস রায়
সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার।

বানারহাট ডাকঘরে সমস্যা

প্রায় তিন মাস হতে চলল বানারহাট ডাকঘরে চারজন কর্মচারীর স্থলে দুজন কর্মচারী দিয়ে কাজ চলছে। আবার মাঝে মাঝে একজনকে ট্রেনিং দেবার জন্য নিয়ে যায়। এ অবস্থায় গ্রাহকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বয়স্ক নাগরিকদের কষ্টও বিবেচ্য। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো প্রায়শই লিংক থাকে না। উল্লিখিত অসুবিধা দূর করতে কর্মচারীর সংখ্যা বর্ধিত করা ও লিংকের ব্যবস্থা করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমরেন্দ্রনাথ মজুমদার
থানাপাড়া, বানারহাট।

লজ্জা

ইতিপূর্বে জেনেছিলাম আমাদের এই বঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লির ডোমের চাকরির জন্যে আবেদনকারী অনেকেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। এবার জানলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিয়োন, হেল্পার বা সহায়কের ৭০টি পদের জন্য আবেদনকারী প্রায় ১১ হাজার এবং সবচেয়ে লজ্জার ও কষ্টের, আবেদনকারীরা হলেন বি–টেক, এম–টেক স্নাতক, স্নাতকোত্তর, গবেষক এমনকি পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা। যদিও এই পদগুলির ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার যে সার্বিক উন্নতি হয়েছে তার বড়ো প্রমাণ এইসব উচ্চশিক্ষিত বেকার ছাত্রছাত্রী। আমার প্রশ্ন, সামান্য চাকরির জন্য এইসব ডিগ্রিধারী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যখন তুমুল লড়াই তখন সাধারণমানের ডিগ্রিধারীদের ভবিষ্যৎ কী ?

কমল ভাওয়াল
সার্কুলার রোড, জলপাইগুড়ি।

শিলিগুড়িতেই প্রথম

সারা রাজ্যের মধ্যে শহর শিলিগুড়িতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রিডিং অ্যান্ড ম্যাট্রিক মেলা। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অন্তর্গত, শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সার্কেলগুলির প্রতিটি বিদ্যালয় তাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দেয়াল পত্রিকা ও মডেল সহ উপস্থিত ছিল এই মেলায়। লক্ষ্য ছিল, স্কুলগুলি বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ কীভাবে ব্যবহার করছে তা দেখা। এই রিডিং অ্যান্ড ম্যাট্রিক মেলায় সর্বশিক্ষা, মিশন শিশুদের বৌদ্ধিক ও জ্ঞানের বিকাশের মাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছে। সর্বশিক্ষা মিশন সন্ধানও পেয়েছে মূল প্রতিভার। স্কুলগুলির অ্যাকটিভিটিভিত্তিক প্রতিযোগিতা চলে এই মেলায়। পাশাপাশি ব্যবস্থা ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যা মনকে নির্মল ও ক্লান্তিহীন রেখেছিল অনেকটাই। শেষে ছিল পুরস্কারের বিতরণী অনুষ্ঠান, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জয়ী হওয়ার মনোভাব জাগ্রত করেছিল। সরকারকে শিশুদের মধ্যে এই সৃষ্টিশীলতার বীজ বপন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই রিডিং অ্যান্ড ম্যাট্রিক মেলা যেন আবারও আয়োজিত হয়। যেন তাতে কোনো শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাদ না যায়। শিক্ষকরা যেন থাকেন সেখানে তাদের পথ দেখানোর দূত হয়ে।

শুভজিৎ বোস, শিক্ষক
নকশালবাড়ি, দার্জিলিং।

মধ্যযুগীয় বর্বরতা ফিরে এসেছে !

সমাজ–সংসার দুর্নীতিতে ভরে গিয়ে কোথায় নেমে গিয়েছে ভাবা যায় না। এত অধঃপতনে কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন নিত্যদিনের ঘটনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্ষণ। প্রতিদিনই কোনো না কোনো জায়গায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে শোনা যায়। এসব দেখে মনে হয় মধ্যযুগীয় বর্বরতা ফিরে এসেছে। ধর্ষণকারী মানে কামুক পুরুষ, সে শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী যে কেউ হতে পারে।

ধর্ষিতারও কোনো বয়স নেই। ৩/৪ বছরের দুধের শিশু থেকে শুরু করে ৭০/৭৫ বছরের বৃদ্ধাও ধর্ষণের শিকার। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেই বলেই এগুলি চলছে। এদের অত্যাচারে মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রাতবিরেতে প্রয়োজনে কোথাও একা যেতে হলে মেয়েদের বিপদ।

সম্প্রতি যে নারকীয় বর্বরোচিত ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল কলকাতার অভিজাত বেসরকারি স্কুলে তাতে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। স্কুলের চার বছরের নার্সারির ছাত্রীকে চকোলেট দেবার লোভ দেখিয়ে দুজন শিক্ষক শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে শিশুটির উপর যৌন নির্যাতন চালায়। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ভরতি হয়েও এসব বেসরকারি স্কুলে নেই কোনো নিরাপত্তা। শুধু শিক্ষক নয়, অন্য পেশাজীবীরাও এরকম বর্বরতা দেখাচ্ছে। কী হবে এ সমাজের ? সমাজ বাঁচাতে হলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার।

শিপ্রা শিকদার
মোহন্তপাড়া এক্সটেনশন, জলপাইগুড়ি।

পঁ্যাচফোড়ন

পয়লা বৈশাখের পাঁচালি

অ্যান্টনি সরকার

নতুন বছর আসলে একটা কনসেপ্ট মাত্র। কে না জানে, নতুন বছরে আসলে কিছুই নতুন হয় না। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো নতুন করে ছাপা হয় কেবল। ইংরেজি হলে ইংরেজি। বাংলায় হলে বাংলায়। তারিখ বদলে যায়। বছর বদলে যায়। সংখ্যা বদলে যাওয়ার উপর ভর করে করে আমাদের বয়সের গুনতি। বা বলা ভালো আমরা কে কতটা বেশিদিন কাটিয়ে ফেললাম একে অপরের সঙ্গে সেটারই একটা হিসাব কষে ফেলা ছাড়া ক্যালেন্ডারের প্রকৃত কাজ কি আর কিছু আছে? মনে হয় না।

তাহলে কেন এই নতুন বছর নতুন বছর করে আহ্লাদ? পুরোটাই কি ন্যাকামো? তা সেকথা বলাটাও একেবারে উচিত হবে না বোধহয়। আসলে আমাদের এই রোজকার ডাল–ভাত আর আলুসেদ্ধ জীবনে নতুন করে আর কী–ই বা আসবে? কী–ই বা হওয়ার অথবা ঘটার আশা করে থাকেন আপনি, বলুন? নতুন সঙ্গী পাবেন? বস আপনার প্রতি ভালো ব্যবহার করা শুরু করে দেবেন আচমকাই? আপনার যে বন্ধু স্কুলে বসত লাস্ট বেঞ্চে অথচ এখন ঠিকাদারির পয়সায় দিনকে রাত জ্ঞান করছে, সে কি আপনার কাছে এসে নতজানু হয়ে বসবে? বাড়িওয়ালা মিষ্টিমুখে এসে বলবে, সামনের মাস থেকে ভাড়া কমিয়ে দেওয়া যাক, কী বলেন মশাই? এসবের একটাও নিশ্চয় ভাবেন না। বেতন বাড়বে অযাচিতভাবে, প্রোমোশন ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়বে, একধাক্কায় ঢোলগোবিন্দ থেকে হয়ে যাবেন শাহরুখ খান– এসব নববর্ষীয় মিরাকেলেও বিশ্বাস আছে নাকি আপনার? নেই তো? তাহলে আর নতুন বছরে নতুন কিছু হোক বলে শুভেচ্ছা জানিয়ে কী হবে?

লাভ একটাই, সেটা হল এই একটা দিন আমরা বাকি বছরটা, যেটা গিয়েছে এবং যেটা আসছে, দুটোরই কথা ভুলে গিয়ে একটু মোচ্ছবে মেতে উঠতে পারি। একটু ফুর্তি করতে পারি। হায় পুরোনো বছর আর আয় নতুন বছর বলে একটু হা–হুতাশ, একটু উল্লাস করতে পারি। বাংলা নতুন বছরের দোহাই দিয়ে এই দিনটায় ধুতি–পাঞ্জাবি অথবা জামদানি ইত্যাদি পরতে পারি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ফোনে বাজিয়ে নিতে ইচ্ছা করে পুরোনো দিনের বাংলা গান। ছোটোবেলায় যেসব পদ বাড়িতে নিয়মিত খেতাম সেই পদগুলোই গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচ করে এদিন কোনো ব্র্যান্ডেড হোটেল থেকে কিনে খেতে পারি। এবং সবথেকে বড়ো কথা হল, বাংলা নববর্ষের দোহাই দিয়ে এদিন আমরা অনেক কষ্ট এবং সময় খরচ করে স্মার্টফোনে বাংলায় টাইপ করে করে শুভেচ্ছা পাঠাতে পারি রাম–শ্যাম–যদুকে।

এসবও কি কম পাওয়া বলুন? সব হারানো লোকেদের তো কিছু না কিছু থাকতেই হবে। অন্তত একটা সেন্টিমেন্ট। আমাদের যেমন আছে ওই আহা আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম জাতীয় নস্টালজিয়া। আর বুকের মধ্যে একটা মন কেমন করা হু হু ভাব। সেই ভাবটার নামই পয়লা বৈশাখ।